তারিখ 29 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ও ধর্মঘট

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

আমাদের ধর্মঘট এত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখন তা আর সাধারণ মানুষের ওপর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব সৃষ্টি করে না। এই সাধারণ ধর্মঘটের পাশাপাশি অবশ্য ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মঘট যে নেই তা নয়। ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে যখন সাধারণ ও বৃহত্তর কোন ইস্যু বা আদর্শ স্থান পায় তখন তা সর্বসাধারণের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই শ্রেণীর অসংখ্য ধর্মঘট এদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর গঠনগত পরিবর্তনের সহায়তা করেছে। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন অভিমুখী ধর্মঘট বা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ধর্মঘটের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সব সময় ধর্মঘটের মাধ্যমে বৃহত্তর আদর্শ বা কল্যাণবোধের চেতনা প্রতিফলিত হয় তা নয়। ধর্মঘটের একটা সৌখিন রূপ আছে। যখন সামনে কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে না তখন ধর্মঘট করাটাই একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

ধর্মঘট যারা আহবান করেন- তার পেছনে যে কোন উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন- প্রতিপক্ষ সব সময়েই দুর্বল। একজন দোকানদার ধর্মঘটের সময় দোকান বন্ধ করতে না চাইলেও খুলে রাখতে পারেন না। তিন-চারটে টিল বা তিন-চারজন ধর্মঘটীদের প্রবেশই তাঁর কাছে আতংকের বিষয়। সাম্প্রতিককালে ছোটখাট ইস্যু নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডেকে সেগুলো বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত সহজ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন স্কুলে কয়েকজন স্কুল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে স্কুল হবে না বললেই অভিভাবকরা মনে ভীতি নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতে দ্বিধাবোধ করেন না। নিজের সন্তান-সন্ততিদের কোন রকম ক্ষতি হোক- অভিভাবক হিসেবে তা তাঁদের কাছে প্রার্থনীয় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহবান ও সফল করা অধিকতর সহজসাধ্য ব্যাপার। ধর্মঘট আহবানকারীর দু'একজন দারোয়ানকে প্রধান ফটক খুলতে বারণ করলে কোন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে না এবং তাতেই ধর্মঘট সফল হয়। অনেক সময় ছাত্রনেতাদের একজন দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে নিজেদের কাছে রেখে দেন। সকালে ক্লাস করতে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশপথ অবরুদ্ধ দেখে বাড়ি চলে যায়। এভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় বিনা প্রতিরোধে ধর্মঘট পালিত হয়ে থাকে। শুধু ব্যতিক্রম দু'তিন দলের মধ্যে সংঘাতের সময়। তখন অন্য দলরা অপরপক্ষের ধর্মঘটে বাধা দেয়।

২০ জুলাই ছাত্ররা ধর্মঘট ডেকেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন ও অন্যান্য ফিস বৃদ্ধির প্রতিবাদে। ছাত্রদের ধর্মঘট আহবানের পেছনে এই দাবির যৌক্তিকতা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বিচারের সুবিধের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেয়া যায়। এখানে বিএ অনার্স ও এমএ শ্রেণীর (কলা অনুষদ) ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বেতনের ফি যথাক্রমে দশ টাকা ও বারো টাকা (টাকার এই অনুপাতের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে)। ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বেতনের এই প্রক্রিয়া বহুদিন থেকে চলে আসছে। পাকিস্তান আমলে ছাত্র-ছাত্রীরা দেড় মাসের ইনসটলমেন্টে বছরে আটবার এই বেতন জমা দিতেন। উনিশ শ' চৌষট্টি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রভাষকের মূল বেতন ছিল আড়াই শ' টাকা। অন্যান্য ভাতা মিলিয়ে একজন অবিবাহিত শিক্ষক দু' শ' সত্তর-আশি টাকার মত মাইনে পেতেন। সে সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের যে বেতন ছিল বর্তমানেও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক আড়াই শ'র জায়গায় তিন হাজার টাকার বেশি মাইনে পান। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন ফি আজও বৃদ্ধি হয়নি। যে সময় ছাত্রদের বেতন ছিল মাসিক বারো টাকা তখন লাক্স সাবানের দাম ছিল ছ'আনা বা সাঁইত্রিশ পয়সা, এক প্লেট মোরগ পোলাও পাওয়া যেত পঞ্চাশ পয়সায়, মিষ্টির দাম ছিল তের পয়সা, ডানোর দাম ছিল কুড়ি টাকার নীচে। সেই জিনিসের দাম বেড়ে হয়েছে ন' টাকা, চব্বিশ টাকা, ছ'টাকা, পৌনে চার শ' টাকা। শিক্ষকদের মাইনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি- যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমানে যে কোন স্কুলে নীচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন এক শ' টাকার কম নয়। অন্যপক্ষে বহু কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন সাত শ' টাকা থেকে এক হাজার টাকার ওপরে। ছাত্রসমাজ ছাত্রসমাজের সার্বিক কল্যাণ করে- একথা ভাবা স্বাভাবিক। তাই যদি হয়, তাহলে ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত আদর্শ ও লক্ষ্যের পথ অনুসরণ করে। যেখানে স্কুলে একজন শিক্ষার্থী এক শ' টাকা থেকে পনের শ' টাকা মাসিক বেতন দেয়- সংগ্রামকারী ছাত্রসমাজ কি এই শ্রেণীর অসাম্যের বিরুদ্ধে কখনো আঘাত করে প্রতিবাদ করেছেন? তাঁরা তা করেননি বলে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘটের যৌক্তিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনে হয়, ধর্মঘটের কোন ইস্যু সামনে না পেয়ে শিক্ষার্থীরা অযৌক্তিকভাবে বেতন বৃদ্ধির নাম করে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়েই সুলভ মূল্যে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব- অন্য কোথাও নয়। শিক্ষার্থীরা যেমন নামমাত্র বেতন দেন, তেমনি ছাত্রাবাসেও প্রায় বিনামূল্যেই বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধে লাভ করেন। ছাত্রাবাসে সিট রেন্ট পাঁচ বা সাত টাকা মাত্র। এই অর্থে শুধু ঢাকা নয়, বাংলাদেশের কোন স্থানে চৌকিতে পাশাপাশি শুয়ে ছারপোকার কামড় খেয়েও শুধু রাত্রিবাসের সুযোগ পাবেন না। সেখানে ঘরে আছে প্রয়োজনীয় আসবাব ও ফ্যান এবং বিনামূল্যে রান্নার ব্যবস্থা। সব ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীদের আহারের ব্যবস্থা থাকলেও অনেক ছাত্র-ছাত্রীই নিজেদের ঘরে হিটারে রান্না করে থাকেন। এভাবে রান্না করা অবৈধ এবং এজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। একটা হিটার ব্যবহারে বাতি জ্বালানোর চেয়ে চারগুণ বিদ্যুৎ খরচ হয়। ধনতান্ত্রিক দেশেও এই নিয়মের দুটো রূপ আছে। আমেরিকা ও ক্যানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে চব্বিশ ঘন্টা হিটিং সিস্টেম চালু থাকে। গ্রেট ব্রিটেনে এই ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে ছ'টা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত এবং বিকেল চারটে থেকে দশটা পর্যন্ত হিটিং সিস্টেম চালু থাকে। প্রয়োজন হলে ছাত্ররা কয়েন ব্যবহার করে সীমিত সময়ের জন্যে হিটিং সিস্টেম চালু রাখতে পারে। শিক্ষিত ও সভ্য নাগরিকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন।

দেশ আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে প্রশাসনের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় পুরোনো নিয়মের পরিবর্তনের। যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়মের পরিবর্তন ঘটে থাকে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেতন দশ টাকা হারে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তার প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গনের উন্নতির জন্যে। শিক্ষার্থীদের বেতন, শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন ছিল অত্যন্ত আধুনিক। শিক্ষকদের ঘরে ছিল তিনটে করে নিয়ন বাতি, বাথরুম ছিল পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারের উপযোগী, ক্লাসরুমগুলো ছিল উন্নত- সেখানে ছিল ভাল বেঞ্চি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফ্যান ও বাতি। বর্তমানে শিক্ষকদের ঘরে নিয়ন বাতির পরিবর্তে বাল্ব বলে, ক্লাসরুমের বেঞ্চি অসমান ও ধুলাচ্ছন্ন সব ফ্যান ঠিকমত চলে না, বাল্ব না থাকায় শ্রেণীকক্ষ অন্ধকার। ঘরের জানালা খোলা যায় না, বাথরুমের কল অকেজো, কমোড ভাঙা ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা চুনকাম করা দেয়ালে টাকা খরচ করে স্লোগানে ভরে দেন, কিন্তু অব্যবহারযোগ্য বাথরুম বা শ্রেণীকক্ষ সম্পর্কে কোন কথা বলেন না। কেন তাঁরা বলবেন না? তাঁদের আন্দোলন যদি শিক্ষার্থীদের কল্যাণ অভিমুখী হয় তাহলে নিজেদের এসব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মূক হয়ে থাকার কারণ কী? শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধি হলে শিক্ষাঙ্গনে সুযোগের সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে, পরনির্ভরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

সরকারী অনুদানে এদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণে প্রতি বছর অনুদানের হার বৃদ্ধি করতে হয়। আমরা যদি চিন্তা করি যে, সরকারী অনুদানের অর্থই জনসাধারণের অর্থ। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের অর্থই অনুদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এই যুক্তি আংশিক সত্য ও যথার্থ। দেশের প্রতিটি নাগরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে অর্থ জোগালেও তাঁদের সবার সন্তানের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় লাগে না। তাঁদের স্বার্থ অনুদানের সঙ্গে যুক্ত নয়। দেশের শিক্ষাবিস্তারে ও প্রবৃদ্ধির জন্যে অনুদান প্রয়োজনীয় হলেও এবং অনুদানের হার বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজনের হারের সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্ন অযৌক্তিক হতে পারে না।

সে জন্যে এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির দিকটি স্কুল ও কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত বেতনের হারের সঙ্গে তুলনা করে এই দিকটি অত্যন্ত সচেতনভাবে চিন্তা করতে হবে। যেখানে দেশের প্রতিটি জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে বেতনের হার স্থির হয়ে থাকতে পারে না। শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে বেতন বৃদ্ধির বাস্তব দিক সামনে নিয়ে। যাতে বেতন বৃদ্ধির হার তাঁদের অভিভাবকদের কাছে ভার না হয়ে দাঁড়ায়। অবাস্তব ধর্মঘট আহবানের মাধ্যমে বাস্তব সত্যকে পরিহার করা সম্ভব নয়- তাকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষার্থীরাই এদেশের আগামী প্রজন্মের প্রতিনিধি- তাঁদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে যৌক্তিক দিক বিচার করা। কোনভাবে বাইরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া নয়।

দেশ আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে প্রশাসনের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় পুরোনো নয়মের পরিবর্তনের। যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়মের পরিবর্তন ঘটে থাকে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেতন দশ টাকা হারে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তার প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গনের উন্নতির জন্যে। শিক্ষার্থীদের বেতন, শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করে।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : প্রাবন্ধিক, গবেষক কলাম লেখক, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।